স্বামী বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন : আগে ও পরে

স্বামী ঋতানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ কোনও ব্যক্তি নন, তিনি ভবিষ্য-সভ্যতার এক প্রতিরূপ—প্রতিমূর্তি স্বয়ং। কেবল অতীত ভারতবর্ষের গৌরবে আচ্ছন্ন না থেকে তিনি ভবিষ্য-ভারত গঠনের স্বপ্নে বিভোর গণ্ডিভাঙা এক সন্ন্যাসী, ভাবী ভারতের চিত্রনির্মাতা। শুধু তাই নয়, নতুন জগৎ নির্মিতি ছিল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। তিনি যেন এক হাতে ভারতকে এবং অপর হাতে জগতকে যুগপৎ নির্মাণ করে চলেছিলেন।

দার্শনিক তিন শ্রেণির—ভাববাদী, বস্তুবাদী এবং আদর্শ-রূপায়ণবাদী। শেষোক্ত দার্শনিক সম্প্রদায় উচ্চ ভাবসমূহকে বাস্তবের সমস্যা সমাধানে কার্যকরী করে তোলায় একান্ত মনোযোগী। এঁরা আদর্শবাদ ও প্রয়োগবাদের সমন্বয়কারী। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এই ভাবধারার। চিন্তাভাবনা, আদর্শ যত উচ্চই হোক না কেন, তাকে জীবনযুদ্ধে প্রয়োগ করে ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণসাধন না করা পর্যন্ত সেই তত্ত্বকে তিনি খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাননি। তাঁর মতে, সেই সমাজই সর্বোচ্চ যেখানে সর্বোত্তম তত্ত্ব বা সত্যগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়।

সংস্কার এবং রাজনৈতিক আন্দোলন বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অথবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো পূর্বসূরিদের থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সম্পূর্ণ মৌলিক, এক স্বতন্ত্র ধারার প্রবক্তা। 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর বিপরীতে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ওপর জোর দেওয়া ছিল ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য—ইতিহাসবিদ সুশোভন সরকার যাকে 'A sharp emphasis' বলে চিহ্নিত করেছেন। স্বামীজীর মতে, শিক্ষার শক্তিতে মানুষের মনে তাগিদ সৃষ্টি হলে সংস্কারের জন্য আন্দোলন বা সরকারি আইন প্রণয়ন—কোনওটিরই আর প্রয়োজন থাকে না। মানুষের স্বাধীন সত্তা ও অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাসী স্বামী বিবেকানন্দ এই দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কার সাধনের এক চিরন্তন সুষ্ঠু সমাধানের পথ বাতলে গেছেন। তাই তিনি ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর 'sharpest emphasis' দিয়েও অন্য দেশের ও সভ্যতার যা কিছু উত্তম ও কল্যাণকর, তাকে গ্রহণ করতে সর্বদা হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত রেখেছিলেন।

নিরালম্ব, কপর্দকহীন সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ভারত পর্যটন করে চলেছেন। দেখছেন বুভুক্ষু, নিরন্ন ভারতবর্ষকে। দেশ সামাজিক ক্ষেত্রে অশিক্ষা ও কুসংস্কারে জর্জরিত, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশে পরিণত। অর্থনৈতিক দিক

থেকে চরম শোষণ ও অত্যাচারের ফলস্বরূপ দারিদ্র্য দেশটিকে যেন একেবারে প্রাণহীন করে রেখেছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা বৌদ্ধিক—কোনওরকম স্বাধীনতাই তার নেই। এরই মধ্যে দেশবাসী ধর্মকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে। স্বামীজী ঘোষণা করছেন : ভারতবর্ষ মরতে পারে না, ভারতবর্ষ উঠবে। অতীত ভারত গৌরবপূর্ণ ছিল, বর্তমানে পড়ে গেছে বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ ভারত অতীতের সমস্ত গৌরবকে ম্লান করে আবার উঠবে। এক্ষেত্রে অপরাপর চিন্তকদের তুলনায় স্বামী বিবেকানন্দ ক্রান্তদর্শী ঋষি। তাঁর অসাধারণ ইতিহাসজ্ঞান ও সুদূর ভবিষ্যদৃষ্টি তাঁকে অন্যদের থেকে পৃথক করেছিল। মৃতপ্রায় দেশটির মধ্যে সঞ্জীবনীসুধারূপ ধর্মশক্তি প্রবহমান—কেবল তাকে অবলম্বন করেই ভারতবর্ষ একদিন বেঁচে উঠবে। এ হল স্বামীজীর এক স্বকীয় আবিষ্কার। কিন্তু কীভাবে?—এই চিন্তাই তাঁকে অধীর করে তুলেছিল।

স্বামীজী তখন হাতরাসে। শরৎচন্দ্রের (পরবর্তী কালে স্বামী সদানন্দ) বাসায় আছেন। স্বামীজীর আনন্দময় সান্নিধ্যে শরৎ উল্লসিত। একদিন তিনি স্বামীজীকে গভীর চিন্তান্বিত দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। স্বামীজী আবেগজড়িত ভাষায় শরৎচন্দ্রকে তাঁর জীবনের মূল রহস্য—শ্রীরামকৃষ্ণ-আদিষ্ট মহান কর্ম এবং তার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কথা জানালেন। জীবোদ্ধারের মহৎ দায় তিনি কী উপায়ে সম্পন্ন করবেন, এই গুরুভার লাঘব করতে কারা-ই বা এসে মাথা পেতে দেবে—এইসব ভেবে তিনি চিন্তাকুল।

স্বামীজী এই প্রথম অন্য কারও কাছে তাঁর জীবনের 'মিশন' সম্পর্কে মুখ খুললেন। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, ঈশ্বরতন্ময়তায় যে-শ্রীরামকৃষ্ণের পরনের কাপড় ঠিক থাকত না, তিনিই আবার নরেন্দ্রনাথকে 'মায়ের কাজ করতে হবে' বলে যেসব প্রসঙ্গ করতেন, তার তাৎপর্য ভারতবর্ষ ও জগতের কল্যাণসাধন! ধীরে ধীরে নিজ জীবনের উদ্দেশ্যটি স্বচ্ছ হতে থাকে স্বামীজীর মনে। দাক্ষিণাত্যের কিছু উদ্যমী যুবক স্বামীজীর সান্নিধ্যে এসে বিস্মিত হয়ে ভাবে : এই অধঃপতিত ভারতবর্ষে এখনও এমন জগৎ-আলোড়নকারী ব্যক্তিত্ব আছেন, যিনি বিদেশে গিয়ে ভারতবর্ষের ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার কথা বললে মানুষ তাঁর এবং তাঁর দেশের মহিমা অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারবে। মূলত তাদেরই প্রস্তাবে স্বামীজী উদ্দীপিত হলেন। প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুমতিসূচক দর্শন ও পরে শ্রীমা সারদা দেবীর অনুমোদনপত্র পেয়ে স্বামীজী নতুন উদ্যমে আমেরিকা যাত্রা করলেন।

আমেরিকায় তাঁর জন্য 'গেলেন-দেখলেন-জয় করলেন'—এমন কুসুমকোমল পথ অপেক্ষা করছিল না। বরং প্রতি পদে তীব্র প্রতিকূলতা তাঁর আশাকে প্রথম থেকেই চূর্ণবিচূর্ণ করতে উদ্যত। জগন্মাতার উপর নির্ভরশীল, কোনওরকম পরিকল্পনার অপক্ষপাতী সন্ন্যাসী জাগতিক ব্যবস্থাপনার পুঙ্খানুপুঙ্খে নাজেহাল ও বিপর্যস্ত হতে থাকেন। পরিচয়পত্র-শীতবস্ত্র-বাসস্থান কিছুই নেই, শিকাগোর উচ্চমানের জীবনযাপনে অসামর্থ্য কারণ সঞ্চিত তহবিল শূন্যপ্রায়, এদিকে ধর্মমহাসভার বিলম্ব। সবকিছুই যেন সরল-সাদাসিধে অনভিজ্ঞ সন্ন্যাসীকে জগতের কঠোর রূপের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। সম্বল শুধু অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং ঈশ্বরে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। তারই বলে সবকিছুর জোটপাট হতে থাকে। ব্যয়বহুল শিকাগো ছেড়ে বস্টন যাওয়ার পথে রেলগাড়িতে হঠাৎ আলাপ হয় প্রৌঢ়া ক্যাথেরিন এবট স্যানবর্নের সঙ্গে। উপেক্ষিত সন্ন্যাসীকে মাতৃসমা এই মহিলা নিজ আবাসে নিয়ে যান। পরিচয়পত্রের জন্য প্রফেসর জন রাইটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। দু-একটি কথাবার্তা বলেই প্রফেসর রাইট প্রকৃত জহুরির মতো নিমেষে উপলব্ধি করেন সন্ন্যাসীর জ্ঞান-বিদ্যা-মেধা ও প্রজ্ঞা। তিনি বলেছিলেন, এ-হেন সন্ন্যাসীর কাছে

পরিচয়পত্র চাওয়া আর সূর্যকে তার আলো বিকিরণে অধিকার আছে কী না—জিজ্ঞাসা করা সমতুল! তখনও সর্বসমক্ষে বিবেকানন্দের অন্তরের আলো বিচ্ছুরিত হয়নি। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনও মানুষ সম্পর্কে অপর কোনও মানুষের এত বড় প্রশংসা আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। ড. ব্যারোজকে লেখা পরিচয়পত্রে প্রফেসর রাইট নবীন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জ্ঞানকে তাঁদের দেশের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপকদের সমষ্টিভূত জ্ঞানের চেয়েও বেশি বলে নির্ধারণ করলেন।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর। শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউট হল। ধর্মমহাসম্মেলন শুরু হল। বক্তব্য রাখার জন্য প্রথমদিকে আহ্বান এলেও স্বামীজী বলতে উঠলেন না। কিছু পরেও না। এরপর কর্তৃপক্ষের একজন জানালেন, এবার বক্তব্য না রাখলে তাঁর সুযোগটি চলে যাবে। না, সুযোগ হারানোর জন্য তিনি পাশ্চাত্যে যাননি। পরবর্তীতে বালকবৎ সরল স্বীকারোক্তি তাঁর : তিনি ভীত হয়ে পড়েছিলেন, এমন বুধমণ্ডলীর নক্ষত্রসমাবেশে আগে তিনি বক্তৃতা করেননি, মুখ শুকিয়ে আসছিল। অবশেষে মা সরস্বতীকে প্রণাম জানিয়ে তিনি শুরু করলেন। জন হেনরি ব্যারোজ সম্পাদিত বৃহদাকার দু-খণ্ডের 'The World's Parliament of Religions' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম দিনের বক্তৃতা প্রকাশের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে একটি বাক্য লেখা আছে—"When Mr. Vivekananda addressed the audience as 'Sisters and brothers of America', there arose a peal of applause that lasted for several minutes." অক্সফোর্ড ডিকশনারি বলছে, 'Several' মানে 'more than two'। অর্থাৎ সম্বোধনটি শুনেই দু-মিনিটের বেশি সময় ধরে করতালি ধ্বনিত হয়েছিল। ছোট হরফে সূক্ষ্মাকারে মুদ্রিত উপরিউক্ত পুস্তকটির এক পৃষ্ঠার সামান্য কম স্বামীজীর সেই বক্তৃতাটি। ইংরেজি বাণী ও রচনায় সেটি এক পৃষ্ঠার সামান্য একটু বেশি। বহুল চর্চিত সেই ভাষণ। আর তারপর সব ইতিহাস।

পরে আক্ষেপ করেছিলেন স্বামীজী। কেননা, বড় বড় পণ্ডিতরা সকলে ভাষণ লিখে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন। তিনি 'মহামূর্খ', সেসব কিছুই তৈরি করে নিয়ে আসেননি। জগতের সৌভাগ্য এই যে স্বামীজী প্রস্তুত করে বক্তৃতা দেননি। প্রস্তুতি যে বহুদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল! যেদিন শিশুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ সপ্তর্ষিমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ ঋষির গলা জড়িয়ে কাতরস্বরে আহ্বান জানিয়েছিলেন—সেই ক্ষণটি থেকেই।

আরও একটি কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই স্বামীজীর জীবনে যেকোনও ঘটনার মধ্যে নিহিত আছে মানুষকে অনুপ্রেরণা প্রণোদনের আভাস। প্রথমবার ওই সুবিশাল জনসভায় বক্তৃতা প্রদানের সময় স্বামীজীর যে-মানসিক ও শারীরিক অবসাদ, তেমনটা তো যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের মতো বীরের জীবনেও দেখা গেছে—শরীর অবসন্ন, মুখ শুষ্ক, সর্বাঙ্গে কম্পন, গাণ্ডীব স্খলিত হওয়া, সর্বাঙ্গে জ্বালা অনুভব। যে-ক্ষেত্রেই হোক না কেন, 'ডেবিউ'-র সময় যেকোনও ব্যক্তির সর্বসমক্ষে পারফরমেন্সে নামার চিরন্তন অনুপ্রেরণা এই পূর্বলক্ষণগুলি। আত্মশক্তি প্রয়োগ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে এতদিনের সংশয়, উত্তেজনা যেন পারফরমারকে কিছু সময়ের জন্য আচ্ছন্ন করে ফেলে। স্বামীজীর জীবনের উক্ত ঘটনা থেকেও জগৎ শক্তি পেতে বাধ্য।

শিকাগো মঞ্চকে স্বামীজী যতটা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, সেরকম আর কেউ করেননি। পূর্বে উল্লিখিত 'The World's Parliament of Religions' গ্রন্থটির মোট ১৬০০ পৃষ্ঠার মধ্যে যে-অসংখ্য প্রতিনিধির ভাষণ মুদ্রিত আছে, সেগুলি পড়লে এই ধারণাটি স্পষ্ট হয় যে, অন্যান্য বক্তা

নিজ নিজ ধর্ম বা সম্প্রদায় কিংবা চার্চ অথবা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আর স্বামীজী শিকাগো মঞ্চকে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর জীবনের 'মিশন' ভারতবর্ষের উত্থান এবং জগৎকল্যাণ সাধনের ব্রতরূপে। এত বৃহৎ ও ব্যাপক উদ্দেশ্য আর কারও ছিল না। ভারত পর্যটনকালেই স্বামীজী অনুভব করেছিলেন, শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলন যেন তাঁরই জন্য অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

শিকাগোয় স্বামীজীর আবির্ভাব ভারতসভ্যতার পরিচয়পত্র। এ যেন স্বাধীনতা, জাগরণ ও পুনর্জীবন প্রাপ্তির ভিত্তি স্থাপনের মুহূর্ত। মিশনারিদের এতদিনের কুৎসা-অবহেলার সমুচিত জবাব।

ভারত-সভ্যতাকে চেনানো ছিল স্বামীজীর প্রথম কাজ। কেন তাঁর এই ভারতপ্রেম? তিনি জানতেন, ভারতবর্ষের কাছেই আছে পৃথিবীকে বাঁচানোর রসদ—ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা।

যেকোনও দেশের বা জাতির শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে দুর্বলতা দূরীকরণে এবং শুভত্ব আহরণে তাঁর ছিল এক বিরল মেধা। ভারতবর্ষের হতদরিদ্র মানুষের জন্য কিছু উপায় করতে অর্থাৎ টাকা জোগাড় করতে তিনি পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন—সেকথা স্বামীজী বারবার স্বীকার করেছেন। শিকাগোয় বিখ্যাত হওয়ার দিন রাত্রে ধনকুবের হেল পরিবারের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করতে পারেননি তিনি। সেই নবনীকোমল শয্যা তাঁর কাছে মনে হয়েছে কণ্টকে পরিপূর্ণ। মেঝেতে শুয়ে দেশের মানুষের দুর্দশার কথা ভেবে আকুল হয়ে কেঁদেছেন এবং জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, তিনি যেন দেশবাসীর জন্য কিছু করতে পারেন। তখনও স্বামীজী জানেন না, যা করবার তা তিনি অপরাহ্ণেই করে ফেলেছেন। সেযুগে সংবাদপত্র ছাড়া আর কোনও গণমাধ্যম ছিল না। পরদিন আমেরিকা ও ইউরোপের প্রতিটি দৈনিক সংবাদপত্রে স্বামী বিবেকানন্দের জয়জয়কার ঘোষিত হল—তিনিই শিকাগো ধর্মমহাসভার সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা ও ব্যক্তি। মিশনারিদের সংবাদপত্র আক্ষেপ করে লিখল : যে-দেশ এমন একজন মানুষকে তৈরি করতে পারে, সেখানে আমরা মিশনারি পাঠাই? বরং তাদের দেশ থেকে এরকম শত শত সন্ন্যাসীর জ্ঞানের আলোক প্রদানের জন্য আমাদের দেশে আসা উচিত। মোক্ষম মূল্যায়ন! একটি মাত্র মানুষকে সামান্য সময়ের জন্য দেখে ও শুনে একটি দেশ ও জাতি সম্পর্কে এমন সামান্যীকরণ—এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা! তাদের ধারণা, বিবেকানন্দের মতো মানুষ ভারতবর্ষের অলিতে-গলিতে পাওয়া যায়! তারা জানে না বিবেকানন্দ অনুপম, অনন্য, অদ্বিতীয়—'তাঁর মতো' বলে দ্বিতীয়টি হয় না!

একটি নির্দিষ্ট স্থানে কালে হলেও অবতারের অবতরণ সমগ্র জগৎকল্যাণের জন্য। বিবেকানন্দের জীবনেও সেটি সত্য! এই মুহূর্তে তিনি ভারতচিন্তায় মগ্ন, আবার পরমুহূর্তেই তাঁর কাছে ভারত-ইংল্যান্ড-আমেরিকার ভেদ লুপ্ত। লোকে যাকে ভুল করে 'মানুষ' বলে, তিনি যে সেই নররূপী নারায়ণের সেবক! তিনি বোঝেন, ভারতবর্ষের আছে জাগতিক দীনতা, আর পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিকতার অভাব। প্রাণবন্ত, কর্মোদ্যমী, প্রখর বিদ্বান জাতিগুলি যেন দিশাহারা, দিগ্‌ভ্রান্ত! এইসব লক্ষ্যহীন মানুষকে দিতে হবে অর্থপূর্ণ জীবনের দিশা, জানাতে হবে আত্মতত্ত্ব। জাগতিক ভোগসুখে পরিতৃপ্ত ওই মানুষগুলিই বেদান্ততত্ত্বের ধারণা লাভে সক্ষম। স্বামীজী তাদের কাছে এতদিনের অশ্রুত দিব্যবাণী শোনালেন। জানালেন, পাপীকে পাপী বলাই সবচেয়ে বড় পাপ। মানুষ অমৃতের সন্তান—স্বয়ং ঈশ্বর। দৈবীসত্তা বা স্বরূপের ওপর যা কিছু গুণ-অবগুণ তা আসলে আরোপিত। ভারতবর্ষ গুণ-অবগুণ দেখে না, দেখে তার নিষ্কর্ষ, সারসত্যটি—সেটি হল দেবত্ব; এবং সেই দেবত্ব

মানুষের স্বরূপাধিকার। অনন্ত সম্ভাবনা প্রকাশের অধিকারী মানুষ। জীবনের উদ্দেশ্য সেই অন্তর্নিহিত দেবত্বের কথা জানা এবং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সেই দেবত্বকে প্রকাশ করতে করতে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হওয়া। পাশ্চাত্য দেখল, শুনল এবং আত্মস্থ হতে শুরু করল। বিবেকানন্দের মধ্যে তারা খুঁজে পেল তাদের কল্পসভ্যতার প্রতিরূপ। সেই মানুষটির মধ্যে তারা তাদের চাহিদা জোগানের অফুরান রসদের সন্ধান পেল। আর স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর ভাবে-ভাষায়, চলনে-বলনে, হাসি-ঠাট্টায় সেসব বিলোতে লাগলেন। দু-হাত ভরে দিতে থাকলেন।

একইসঙ্গে দিতে থাকলেন নতুন ভারত গড়ার দিঙ্‌নির্দেশ। গুরুভাইদের একত্র রাখা, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তদের সমবেত করা, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও কথা প্রচার করা—বিবেকানন্দের এক-একটি পত্র যেন চরম শক্তিশালী বোমার মতো। পৃথিবীর এ-অক্ষ ও-অক্ষ বিবেকানন্দের কাছে মিলেমিশে একাকার। চাই ভারতের উত্থান আর পাশ্চাত্যের মানুষের জ্ঞানচক্ষুর উন্মোচন। আর তা তিনি যুগপৎ করে চলেছেন। তাঁর এক পদক্ষেপ প্রাচ্যে এবং অপর পদক্ষেপটি পাশ্চাত্যে। একটি হাতে ভারত গড়ছেন, আবার অন্য হাতে নতুন বিশ্ব নির্মাণ করে চলেছেন। পাশ্চাত্য থেকে পত্রে জানাচ্ছেন : ''এ-দেশে এক-ঘা মারলে দেশে (ভারতবর্ষ) দশ-ঘা গিয়ে পৌঁছবে।'' তিনি জানতেন, এতদিনের বিদেশি অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতবর্ষ পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষার উপর তাদের দৃষ্টি ও বিশ্বাস স্থাপন করে বসে আছে। বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞানচর্চায় উন্নত পাশ্চাত্যের হৃদয় ও মস্তিষ্ক আগে জয় করতে পারলে ভারতবর্ষের উত্থান সহজ হয়ে যাবে। স্বামীজীর দৃঢ় ধারণা ছিল, দেশ ও জাতি এবং সেখানকার মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতি, সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ দেখে শাসককুল এই ভারতীয় উপনিবেশ ত্যাগ করবে। ভারতবর্ষের মতো সুমহান প্রাচীন সভ্যতার গরিমা উপলব্ধি করে তারা নিজেদের ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণ মনোভাব অনুধাবন করে লজ্জিত হবে। প্রগতি এবং সভ্যতার মাপকাঠি ও প্রথম শর্ত হল স্বাধীনতা। শুধুমাত্র আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে এবং বিদ্বেষ পোষণের দ্বারা গৌরব অর্জন অসম্ভব। স্বাধীনতার যোগ্য হয়ে ওঠাই স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণ।

স্বামীজী দেখেছেন, পাশ্চাত্যের মানুষ ধর্মকে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের সঙ্গে গ্রহণ করলেও তাদের মনের অভ্যন্তরে কোথায় যেন লুকিয়ে আছে এক জন্মগত পাপবোধ। তা তাদের আনন্দের অধিকারী করে তুলতে পারছে না। আনন্দময় পুরুষ হিসাবে তিনি তাদের কাছে ধর্মকে আনন্দের আধার বলে দেখিয়েছেন। তাঁর ভাষণে বৌদ্ধধর্মের দুঃখের কথা নেই, নেই খ্রিস্টধর্মের 'স্বর্গ থেকে পতনের কথা'। আবার অদ্বৈতবাদ অনুসারে জগৎ ও জীবকে ভ্রমস্বরূপ না বলে 'ঘটনার বিবৃতি' বলেছেন তিনি। অজ্ঞান কিংবা মায়ার নেতিবাচক দিকের কথা বলে মানুষকে নিরুদ্যম না করে আত্মস্বরূপের দিকেই সকলের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন। অজ্ঞান সত্য নয়—তা ভ্রমমাত্র। অতএব তার নিরাকরণ সম্ভব; আর সেটিই জীবনের উদ্দেশ্য। এছাড়া অদ্বৈতের একাত্মতা এবং সর্বভূতে একই সত্তার উপলব্ধির ফলে এক নতুন সর্বজনীন ধর্ম গড়ে উঠবে—এই ছিল স্বামীজীর অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি।

স্বামীজী বলেছেন, বুদ্ধের যেমন প্রাচ্যের জন্য একটি বার্তা ছিল, তেমনই তাঁরও একটি বার্তা আছে পাশ্চাত্যের জন্য। তা হল, অন্তর্নিহিত দেবত্বকে কীভাবে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ব্যবহার করা যায়—সেটি দেখানো। সেজন্য তিনি পাশ্চাত্যে চারটি যোগের ব্যাখ্যা করলেন। কর্মপ্রবণ পাশ্চাত্যকে তিনি নিষ্কাম কর্ম তথা অনাসক্ত কর্মের উপদেশ করেছেন। কর্ম পাশ্চাত্যের অস্থিমজ্জায়। অতএব, কর্মকে জড় থেকে চৈতন্যের প্রকাশের

সহায়ক করে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করার সাধনটি পাশ্চাত্যের কাছে সহজতর হবে—এটি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

স্বামীজী দেখেছেন, মন ও মস্তিষ্কে তথ্যের স্তূপীকৃতকরণই জ্ঞানগর্বিত পাশ্চাত্যবাসীর কাছে জ্ঞানসমৃদ্ধির মানদণ্ড। সে-অবস্থা থেকে তাদের আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করতে তিনি জ্ঞানযোগটিকে সম্পূর্ণত পাশ্চাত্যে প্রদান করলেন। স্বামীজীর নজরে এসেছে ধর্মের নামে, গুহ্য সত্যের নামে বিভিন্ন প্রকার ধ্যানপ্রক্রিয়া সেখানে প্রচলিত এবং মানুষ অন্ধভাবে সেসবের পিছনে ছুটছে। ভারতীয় রাজযোগকে স্বামীজী সরলভাবে বিজ্ঞানসম্মত মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের আধারে উপস্থাপন করে প্রকৃত যোগের সন্ধান দিয়ে সমাধিসুখের লক্ষ্যে পাশ্চাত্যবাসীকে উদ্দীপ্ত করলেন। খ্রিস্টধর্ম স্বভাবতই ভক্তিভাব-সঞ্জাত। স্বামীজী যিশুখ্রিস্টের কঠোর ত্যাগ-তপস্যা এবং তাঁর পার্ষদদের যিশুর বাণীপ্রচারে অপ্রতিরোধ্য প্রচেষ্টা ও অসহনীয় লাঞ্ছনাসহন ইত্যাদি মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করায় তারা তাদের ধর্মের প্রতি স্বামীজীর একান্ত ভক্তি ও বিশ্বাসটি উপলব্ধি করল। তারা বুঝল, অমন নিখাদ ভক্তি-বিশ্বাসই খ্রিস্টধর্মের বিপুল উন্নতি ঘটাতে পারে। স্বামীজী তাদের কাছে খ্রিস্টের প্রতি নিজের চূড়ান্ত ভক্তির কথা বলতে গিয়ে এক অভাবনীয় মন্তব্য করেছেন, ''আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তাঁকে আমি আমার হৃদয়ের ভক্তি দিয়ে শুধু নয়, বুকের রক্ত দিয়ে তাঁর চরণ দুটি ধুইয়ে দিতাম।'' পাশ্চাত্যবাসীর কর্মপ্রবণতাকে তিনি ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের সন্তানদের সেবার পথে চালনা করতে চান—যা কিনা খ্রিস্টতত্ত্বের অন্যতম মূল ভিত্তি। একইসঙ্গে একটি চরিত্রের মধ্যে মানবিক প্রবণতার যে-অনন্ত সম্ভাবনা চারটি যোগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে, সেকথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং সর্বযোগের সমন্বয়ে জীবন গঠন যে আগামী বিশ্বের আদর্শ রূপ—সেটিও নির্দেশ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ধ্রুপদি ভারতীয় দর্শনচিন্তার নানা চিরায়ত ভাবনাবীজ আত্মস্থ করে বিচার-অভিমুখকে বিশ্বমুখী করে তুললেন। ঋতবোধের আলোচনায়, আধুনিক বিচারে তিনি অদ্বৈতবাদের সমত্ববোধ ও সমানুভূতির আদর্শকে মানুষের সচেতন নজরে আনেন এবং ব্যাবহারিক জীবনে তার প্রয়োগ যে কতটা সুফলদায়ী, তা জ্ঞাত করেন। মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাই তো সভ্যতার ভিত্তি। নতুন সভ্যতা গঠনের প্রবক্তারূপে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের পদানুগ হয়ে 'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা' অংশটির চেয়েও 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' অংশটির উপর জোর দিয়ে জগৎ-পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়েছেন। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের 'যারই লীলা তারই নিত্য', 'ব্রহ্ম-শক্তি অভেদ' ইত্যাদির প্রাসঙ্গিকতা। জগতকে মিথ্যারূপে না দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি 'মায়ের লীলা' প্রকৃতপক্ষে স্বামীজীর 'মায়া'কে মিথ্যা না বলে 'ঘটনার বিবৃতি' বলে ঘোষণার সমার্থক। নরেন্দ্রনাথের মা কালীকে মানার তাৎপর্য এখানেই। নরেনের মা কালীকে মানায় শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দ ও তৃপ্তি সর্বোচ্চ। তিনি নরেন্দ্রকে একাধারে জ্ঞানী ও ভক্তরূপে দেখতে চেয়েছিলেন। সে-ভাবটিতেই অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে জগৎকল্যাণের প্রচেষ্টার উদ্দীপন ও প্রণোদন নিহিত।

এহেন অন্বেষার অক্ষে 'স্থানিক' ও 'বৈশ্বিক'-এর ভেদ তুচ্ছ হয়ে যায়। এভাবেই চৈতন্যের ইতিবৃত্ত শোনানোর মধ্য দিয়ে স্বামীজীর 'সর্বভূতে সেই প্রেমময়' বহুজনীন হয়ে ওঠে। নানা কাল ও দেশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে একাত্মতা ও সংবেদনশীলতা তাঁকে বিশ্বজনীন আধারে প্রকাশ করল। জীবের সত্তা বা স্বরূপের হদিশ দিতেই তিনি দায়বদ্ধ ও বদ্ধপরিকর। সেটিই তাঁর ভারতপথিক থেকে বিশ্বপথিক হয়ে ওঠার রহস্য।

সামূহিকতার বোধে স্বামীজী সদা জাগ্রত। কৌম

সম্বন্ধে, আঞ্চলিক সন্নিহিতি বা জাতপাত বিন্যাসে, ধর্মীয় ধারণায় বা শ্রেণি-সংবিদে এই সামূহিকতার বোধ নিহিত থাকে। একাধিক সূত্রের টানে বোধটি ক্রিয়াশীল হয়, একমাত্রিকতার টানকে ছাপিয়ে যায় এবং পরিশেষে সংহতির বার্তা ও অভিমুখে তার সরণ ঘটে। সত্তাময়তার প্রকাশই জীবচৈতন্য, সেই চৈতন্যের উচ্চারণ ভাষা-ভাবনায় বিধৃত হল। স্বামীজীর সত্যানুসন্ধান প্রসারিত হল মানবিক অভিজ্ঞতার বিচিত্র অবয়বে—নিছক কার্য-কারণ অন্বিত যুক্তিবোধ থেকে শুরু করে রসগ্রাহী সম্মিলিত ঘরোয়া আলাপে।

শ্রীরামকৃষ্ণের একাত্মবোধ ও অভেদদর্শন তাঁর সরল-সাদাসিধে কথোপকথনের মাধ্যমে এক হিতবাদী দর্শনে পরিণত হয়েছিল। আর সে-আদর্শটি দেশজ সমাজের অন্দরে ক্রিয়াময় সেবাধর্মের ছোঁয়া পায়, তৈরি হয় সংবেদনশীলতা ও আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধনের নবানুভূতি—'জীবে জীবে তাঁরই অধিষ্ঠান'। এ-ব্যাপারটি স্বামীজীর বিশ্লেষণী প্রজ্ঞায় ধরা পড়ে এবং এই দর্শনটির প্রচারই তাঁর জীবনব্রত হয়ে দাঁড়ায়।

একটি খেলার মাঠের বাতিস্তম্ভগুলি যেমন স্টেডিয়ামকে পিছনে রেখে তার সমস্ত আলো মাঠের দিকেই বিচ্ছুরিত করে, তেমনি জগতে নানা সমৃদ্ধ সভ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রচারের অভিমুখটি এতকাল পাশ্চাত্যের দিকেই ঘোরানো ছিল। স্বামীজী তাঁর ঐশী শক্তিবলে প্রচারের সেই অভিমুখটি প্রাচ্যের, বিশেষত ভারতবর্ষের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। আধুনিক ইতিহাসের সেই সময়টি থেকেই ভারতবর্ষের দিকে বিশ্বের নজর পড়ল।

একাদিক্রমে প্রায় সাড়ে তিন বছর পাশ্চাত্যে হৃদয়-মন নিংড়ানো প্রচার সেরে স্বামীজী ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করলেন। যে-বিপুল খ্যাতি ও সম্মান তিনি লাভ করেছিলেন, সেখানেই যদি তাঁর জীবনের কাজ পরিসমাপ্ত হত তথাপি তিনি আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস গড়ার ক্ষেত্রে সর্বকালের এক বিশিষ্ট দার্শনিক, চিন্তক এবং এক উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক পুরুষ হিসাবে পরিগণিত হতেন। অথচ তার পরিবর্তে জীবনের এত বড় সাফল্যকে তিনি তাঁর কার্যধারার ভিত্তি বা সূচনা বলে ধরে নিয়ে নতুন ভারত গঠনে মনোনিবেশ করলেন। মূল ভারত ভূখণ্ডে পৌঁছনোর আগে কলম্বো থেকেই তিনি লক্ষ করলেন মানুষের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা। দেশ উৎসাহ-উদ্যমে ভরপুর, আত্মশ্রদ্ধায় শ্রদ্ধাবান, নিজ পরিচয় পুনরুদ্ধারে উচ্ছ্বসিত। ঘুমন্ত লেভিয়াথান যেন জেগে উঠেছে। যদিও একই সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, কিন্তু দেশের মধ্যে জাগরণ এসে গেছে। এরপর কলম্বো থেকে আলমোড়া—সমস্ত দেশজুড়ে স্বামী বিবেকানন্দকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন এবং তাঁকে নিয়ে মানুষের উন্মাদনা ও উন্মত্ততা। সর্বসাধারণ থেকে ধনী-অভিজাত, রাজা-জমিদার সকলের মধ্যে আত্মগৌরব ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে স্বামীজীর একক পাশ্চাত্য বিজয় ও এরকম উৎকর্ষপূর্ণ আন্তর্জাতিক সাফল্যের মতো ঐতিহাসিক ঘটনা শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয়, বিশ্বের ইতিহাসেও নতুন যুগের সৃষ্টি করল। স্বামীজী জানতেন, লোহা তপ্ত থাকতে থাকতেই তাকে গড়েপিটে কাঙ্ক্ষিত রূপ দিতে হবে। যে-ভাবের স্রোতে জগতকে তিনি প্লাবিত করেছেন, সেই ঢেউয়ের আঘাতে এরই মধ্যে ভারতবর্ষ তাঁর কার্যধারা ও কার্যপ্রণালী গ্রহণে উন্মুখ। স্বামীজী চান তাঁর ভাবস্রোত ভবিষ্যতের জন্য পাকাপাকিভাবে সংরক্ষিত থাকুক। সেই উদ্দেশ্যে তিনি যেসব ভাবনা-ভাবাদর্শের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করতে চাইছিলেন, সেগুলির মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম গুরুত্ব দিলেন ভারতবর্ষের নারী ও সাধারণ মানুষের উত্তরণে বহুবিধ চিন্তাধারার বাস্তব রূপায়ণে। এই ভাবাদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণজীবন থেকেই প্রাপ্ত। বিদেশে থাকতে সেখানকার মেয়েদের স্বাধীনতা, শিক্ষা,

গুণ, বিদ্যা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। স্বদেশের মেয়েদের সম্বন্ধে বলেছেন, শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে এবারে মেয়েরা উঠবে, জগতে মহীয়সী নারীদের আবির্ভাব হবে। ভারতবর্ষের যে-উন্নয়ন পুরুষের দ্বারা পাঁচশো বছরে আনা সম্ভব, সেটি মেয়েরা পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সাধিত করবে। শিক্ষা-শিক্ষা-শিক্ষা—কথাটি তিন-তিনবার ব্যবহার না করলে তাঁর শান্তি হত না। শিক্ষার জাদুমন্ত্রে এমন কোনও সমস্যা নেই যার সমাধান না হয়—এই ছিল স্বামীজীর দৃঢ় প্রত্যয়। সাধারণকে জাগাতে হবে, খাওয়াতে হবে, শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে স্বাধীনতা দিতে হবে, পুরুষের সংস্রব ব্যতীত তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করবে—এই ছিল স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা। শ্রীমার জন্য একটা জায়গা প্রথম করতে হবে—গুরুভাইদের চোখ ফোটাতে একের পর এক পত্রাঘাত করেছেন : ''আগে মা ও তাঁর মেয়েরা, তারপর বাবা ও বাপের ছেলেরা। মা-ঠাকরুণ কী বস্তু এখনও তোমরা কেউই বুঝতে পারনি, ক্রমে পারবে''—ইত্যাদি বলে।

এ-ভাবনাকে কার্যকরী রূপ দিতে স্বামীজী মেয়েদের মঠ স্থাপনের সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা করে রচনায় ও কথায় প্রকাশ করতে লাগলেন। অন্যদিকে ১ মে ১৮৯৭ বলরাম বসুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী পার্ষদ ও গৃহী ভক্তদের সম্মিলিত করে যৌথ অংশগ্রহণে 'রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করলেন—যেটি ১৯০৯ সালে 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামে নিবন্ধীকৃত হয়। সেদিনই শ্রীমা সারদা দেবীকে 'সঙ্ঘজননী' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা স্বামীজীর এক যুগান্তকারী এবং বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত। তিনি উপলব্ধি করেছেন, তিনি চল্লিশ পেরুবেন না। এতদিন মনে উঠলেও, পত্র ও বক্তব্যে যৎসামান্য প্রকাশ ছাড়া শ্রীমায়ের কথা তিনি জনসমক্ষে মুখে প্রকাশ করেননি। আজ শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীমা-স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর বাস্তব রূপ দিতে পুরুষদের এবং মেয়েদের মঠ এগিয়ে চলেছে—রাজনীতির সঙ্গে কোনও সাক্ষাৎ-সংস্রব না রেখে, যেখানে যা কিছু অপূর্ণতা তা দূর করতে। জগতকে নতুন নতুন আলোকরশ্মি প্রদান করে চলেছে—যে-আলোকছটায় উদ্ভাসিত হয়ে জগতের প্রতিটি মানুষ একদিন অনুভব করবে ঈশ্বর এবং সে এক ও অভিন্ন।

স্বামী বিবেকানন্দ আদ্যোপান্ত এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। এ-যুগের প্রফেট হিসাবে জগদ্ধিতের কাজটি বহুমাত্রিক উপায়ে সংসাধন করবেন বলে আধ্যাত্মিকতা চরম লক্ষ্য হলেও সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিকের মানোন্নয়নে ও উৎকর্ষসাধনে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বিচ্ছুরণ হিসাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ তত্ত্ব, ভাব, ভাবনা ও চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে হয়েছে। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে প্রয়োজনের ভিন্নতা থাকায় যেকোনও ব্যক্তি স্বামীজীর যেকোনও দৃষ্টিকোণের দ্বারা উপকৃত ও লাভবান হতে পারে, একথা বলাই বাহুল্য। তাঁর ব্যক্তিত্বের এই বহুবিধ ভাব-ভাবনা উপলব্ধি করে সম্পূর্ণ মানুষটির পূর্ণাঙ্গ ধারণা হয়তো কোনওদিনই করা সম্ভব হবে না। তথাপি বলা যায়, নাস্তিক অথচ জাগতিক উন্নয়নে সচেতন বিভিন্ন মত-পথের অনুরাগী বিদ্বৎসমাজও স্বামীজীর জীবনের অপ্রতিরোধ্য প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে এই অবিরাম দুষ্কর পরিশ্রম ও সাফল্য সম্পর্কে ধারণা করতে সমর্থ হবে। ঐতিহাসিক, সমাজবিদ, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, মানবতাবাদী, শিল্পী, সাহিত্যিক কিংবা দার্শনিক স্বামীজীকে যেদিক থেকেই অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করুন না কেন, তাঁর অভিনব চিন্তা, অনুপম দর্শন এবং আকুল জগৎকল্যাণের ঈপ্সাটি অনুধাবন করতে পারবেন।

ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে শিকাগোয় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব একশো ঊনত্রিশ বছর এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা একশো পঁচিশ বছর ছুঁয়েছে। কালস্রোতে ভাসতে ভাসতে মানুষের নজরের

বাইরে চলে যাওয়ার মতো ঘটনা এগুলি নয়। বরং ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্যে দুটি ঘটনাই দিন-দিন হিমবলের মতো ক্রমান্বয়ে তাদের আকার বৃদ্ধি করে চলেছে এবং চিন্তার রাজ্যে সরলীকরণের পরিবর্তে এক নিগূঢ় সত্যের কার্যকারণ বিন্দুগুলি পূরিত হতে হতে উজ্জ্বলতর রেখায় পরিণত হচ্ছে বলে জনমানস ধীরে ধীরে তা উপলব্ধি করে চলেছে।

এখন যেন এই অনুভব হয় যে, শিকাগোয় বিবেকানন্দের সাফল্য কোনও মৌহূর্তিক বিপর্যাস নয়। ভারতসভ্যতা সংরক্ষণে তথা বিশ্বসভ্যতা নির্মাণে তা বিধি-ঈপ্সিত এবং বর্তমান যুগাবতারের লীলায় জগন্মাতার হস্তক্ষেপ-সঞ্জাত। স্বামীজী তাঁদের হাতের যন্ত্রমাত্র কিংবা বালকমাত্র। স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁরা যেমন সাজে সজ্জিত করেছেন, যেমন কর্মভার অর্পণ করেছেন, তিনি সেটি যন্ত্রের মতো কেবল সম্পাদনা করে গেছেন—স্বীয় 'আমিত্ব'-টিকে সম্পূর্ণত মুছে ফেলে। বস্তুবাদী দার্শনিক ও বৌদ্ধিক পণ্ডিতেরা জগদতীত ক্রিয়াকর্মের গুহ্যস্বরূপের সন্ধান না পাওয়ায় তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টা জগতের সীমায় বেষ্টিত। অপার্থিব, অজাগতিক, অতীন্দ্রিয় সত্য তাঁদের কাছে অধরা—ফলত অপ্রাপ্তির খতিয়ানে লিপিবদ্ধ। অপরপক্ষে স্বামীজী ত্রিকালজ্ঞ ঋষি—প্রফেট। তাঁর জীবনদর্শন ও কর্মধারা স্বীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও প্রজ্ঞাসঞ্জাত। তাঁর প্রভাব চিরায়ত ও কালজয়ী। তিনি ভাবসঞ্চারে ক্ষমতাবান। শব্দশক্তি ও লেখনীশক্তির প্রয়োগে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম শক্তিসঞ্চার তিনি করে গেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ মানুষ নন, রক্তমাংসের মনে হলেও আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে গড়া এক দিব্য তনু।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন শিল্পী। নৃত্যগীতবাদ্যে, যাত্রা-কথকতা-পালা কীর্তনে কুশলী। চিত্রাঙ্কন কিংবা মৃৎশিল্পে তাঁর প্রতিভা নজরকাড়া, উপরন্তু তিনি মানুষ গড়ার কারিগর। যে-কেউ তাঁর ঘরের এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে কিছুদিন যাতায়াত করে তাঁর সান্নিধ্যে এসে অবশেষে যখন অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতেন, তিনি আর পূর্বের মানুষ থাকতেন না—ভিন্ন মানুষে, উন্নততর মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ গড়ার নিদর্শন স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁর জীবনের প্রথম প্রদর্শনী শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউট।

পূর্বে উল্লেখিত 'The World's Parliament of Religions' গ্রন্থে অজস্র প্রতিনিধির একাধিক অধিবেশনে বক্তব্য রাখার ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করা রয়েছে। তাঁদের জীবন ও কৃতিত্ব বিষয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে আমাদের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হওয়ার মতো রসদ তেমন কিছুই জোটেনি। তাঁদের মধ্যে জগদ্‌বিখ্যাত ও যশস্বী কোনও ব্যক্তিত্বের সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। অন্যপক্ষে, মানবসভ্যতা দিন-দিন যত দীন, দিশাহারা ও পথভ্রান্ত হবে, স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ও তাৎপর্য ততই উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশিত হবে এবং মানুষ প্রকৃত মানুষ হওয়ার দিশা পেয়ে উন্নততর সমৃদ্ধ সমাজ ও সভ্যতা গঠনে সমর্থ হবে। এখানেই বিবেকানন্দ-জীবনের সার্থকতা।

মনে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'রাধারাণী' শীর্ষক উপন্যাসটির প্রথম বাক্য : ''রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশের রথ দেখিতে গিয়াছিল।'' রথ দেখা তার উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল একটি ফুলের মালা বিক্রি করে অসুস্থ মায়ের জন্য পথ্য কিনে আনা। রথ অনেকেই দেখতে গিয়েছিল। তাদের কথা লেখকের কাছে অবান্তর ছিল। উপন্যাসটিতে আদ্যোপান্ত 'রাধারাণী'র কথাই তিনি ব্যক্ত করেছেন। তেমনি শিকাগো ধর্মমহাসভায় অনেকেই প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, কিন্তু ওই বিরাট আয়োজনটি যেন সংগঠিত হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দকে আবিষ্কারের জন্য। বিধির লিখনে অন্যেরা যেন সেখানে অবান্তর—কালের কপোলতলে ছায়ামূর্তিমাত্র।